حالات

يجوز فيها إظهار الكفر

যে সকল ক্ষেত্রে
কুফ্‌র প্রকাশ করা বৈধঃ

بقلم الشيخ؛ أبي بصير

عبد المنعم مصطفى حليمة

অনুবাদক

শাইখ আসিম আজওয়াদ (হাঃ)

অনুবাদক
শাইখ আসিম আজওয়াদ (হাঃ)

সম্পাদনা
শাইখ আবু তাহমিদ

প্রকাশনায়ঃ
আদ্- দ্বীন পাবলিকেশন্স
৩৮/ক বাংলাবাজার ঢাকা - ১১০০
Web: www.esabahmediabd.wordpress.com

প্রথম প্রকাশ
মার্চ ২০১৩ ইং
(পাবলিকেশন্স কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

কম্পিউটার কম্পোজ
মুফতি ইমতিয়াজ আহমদ
জি, গ্রাফ কম্পিউটার

গ্রাফিক্স
তওফিক আল- আজাদ

বিঃ দ্রঃ কোন রকম যোজন -বিয়োজন ব্যতীত সম্পূর্ণ ফ্রী বিতরণের জন্য কেউ ছাপাতে চাইলে প্রকাশনা কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ রইল ।

মূল্য ঃ ২০ (বিশ) টাকা মাত্র।

সূচীপত্র

১। ভূমিকা ০৪

২। الإكراه (আল-ইকরাহ্‌)–বাধ্য করা ০৭

৩। التقية (আত-তুক্বয়াহ্‌) প্রতিরক্ষা বা আত্মরক্ষা ১৪

৪। মূলোৎপাটন করার কারণে এবং মারাত্মক ও ভয়াবহ কুফরীকে প্রতিহত করার জন্যে ২০

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمدَ لله نحمدُه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اللهُ فلا مُضل له، ومن يُضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم.

وبعد:

শারয়ী যৌক্তিক কারণ ব্যতীত কুফরী প্রকাশ করা এমন বড় কুফর হিসাবে বিবেচিত হবে যা উক্ত ব্যক্তিকে মিল্লাত (ইসলাম) থেকে বের করে দিবে। সে এটা বিশ্বাস রেখে এবং ভালমনে করে প্রকাশ করুক, অথবা এটা ছাড়া অন্য কোন কারণে প্রকাশ করুক এবং যে কোন কারনে, কিংবা অন্য কোন ধার না নিয়ে প্রকাশ করুক, কোন পার্থক্য হবে না। কেননা বিধান তো বাহ্যিক এবং ব্যক্তি যা প্রকাশ করে তার ভিত্তিতে হয়ে থাকে... আর এটাতো কুফ্‌র ও ঈমান -এর বিধানের অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং; মাসয়ালাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত বিপদজনক। বিশেষকরে আমরা এটা অবগত হয়েছি যে, নিশ্চয় কুফ্‌র এমন বড় অপরাধ যার সমকক্ষ অন্য কোন অপরাধ হতে পারে না। উক্ত ব্যক্তির উপরে এর মারাত্মক কিছু পরিণতি আপতিত হবে, পৃথিবীতে তার উপর কাফির এবং মুর্তাদ -এর বিধানসমূহ প্রয়োগ হবে এবং পরকালে জাহান্নামে চিরকাল অবস্থান করতে হবে।

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنةُ الله والملائكة والناس أجمعين.

خالدين فيها لا يُخفف عنهم العذاب ولا هم يُنظرون

নিশ্চয় যারা কুফরী করে এবং কাফের অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করে, সে সমস্ত লোকের প্রতি আল্লাহর, ফেরেশতাগণের এবং সমগ্র মানুষের লা'নত। এরা চিরকাল তন্মধ্যে অবস্থান করবে। তাদের উপর থেকে আযাব কখনও হালকা করা হবে না এবং এরা বিশ্রামও পাবে না। (সূরা বাক্বারাহঃ ১৬১, ১৬২)

তিনি মহান আল্লাহ তায়ালা আরও বলেছেনঃ

إن اللهَ لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে অংশীস্থাপন করলে তাকে ক্ষমা করবেন না এবং এতদ্ব্যতীত যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন। (সূরা নিসাঃ ৪৮)

তাছাড়া হাদীসে নবী (সাঃ) থেকে বিশুদ্ধ সুত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি (সাঃ) বলেছেনঃ

" اثنتان موجبتان " قال رجل: يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال: " من مات لا يُشرك بالله شيئاً دخل الجنة، ومن مات يُشرك بالله شيئاً دخل النار " مسلم.

দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। একজন সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হে আল্লাহর রসূল (সাঃ) উক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দুইটি কি কি? উত্তরে তিনি বললেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরীক না করে মৃত্যুবরণ করবে, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করে মৃত্যুবরণ করবে, তবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (মুসলিম)

وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رجل: يا رسول الله أيُّ الذنبِ أكبر عندَ الله؟

قال: " أن تدعو لله نداً وهو خلقك " متفق عليه.

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রসূল (সাঃ) আল্লাহর নিকট সর্বাধিক বড় গুনাহ কোনটি? তিনি বললেনঃ আল্লাহর কোন সমকক্ষ নির্ধারণ করা, অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। (বুখারী, মুসলিম)

অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কোন একটি বৈশিষ্ট্যে তুমি তাঁর সমকক্ষ নির্ধারণ করবে অথচ তিনি একাই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন যিনি তোমার পক্ষ থেকে ইবাদত পাওয়ার হকদার।

ফলে শরীয়ত প্রণেতা যে সকল অবস্থায় কুফ্‌র প্রকাশ করার অনুমোদন দিয়েছেন প্রতিটি মুসলিমের উপর কর্তব্য হচ্ছে এ সকল অবস্থা অবগত হওয়া– যেন এমন ক্ষেত্র জেনে নিতে পারে, যাতে চলাচলের সময় কিংবা এতে লিপ্ত হতে বাধ্য হলে সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারে, এবং ইলম ও দলীল ব্যতীত কুফ্‌র প্রকাশ করার পরিধি বাড়িয়ে না দেয়, ফলে সে নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হয়ে যাবে এবং ধমকী ও শাস্তির আওতায় পড়ে যাবে।

যিনি বাস্তব অবস্থা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেন, তিনি জানতে পারবেন যে, নিশ্চয় অন্যান্য মাসয়ালার মত উক্ত মাসয়ালাটিতেও অনেক লোক দুই দলে বিভক্ত

হয়েছে। একজন সীমাহীন বাড়াবাড়ি করেছে, অন্যদল চরম শিথিলতা প্রকাশ করেছে; একদল নিজের ও অন্যান্যদের উপর কঠোরতা আরোপ করেছে।

ফলে তারা প্রশস্ত মুবাহ বিষয়কে সংকীর্ণ করে ফেলেছে এবং অন্যদল কোমল আচরণ করেছে এবং অমনোযোগী হয়েছে, ফলশ্রুতিতে তারা সংকীর্ণ বিষয়কে এমনভাবে সম্প্রসারণ করেছে যে তারা নিষিদ্ধ ও হারাম কর্মে লিপ্ত হয়েছে!।

উক্ত মাসয়ালাহ এর আলোচনা এবং এতে সত্য দিক প্রকাশ করার ক্ষেত্রে উক্ত বিষয়টি আমাদেরকে অধিক উৎসাহ যুগিয়েছে। আমরা উক্ত মাসয়ালায় শিথিলতা ও বাড়াবাড়ির দিকে না ঝুঁকে সত্য প্রকাশ করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

আমরা ইনশাআল্লাহ আলোচনা করার সময় উক্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং ঐ বিষয় যা বিভিন্ন দিক হতে এবং বিভিন্ন ভাইদের পক্ষ থেকে আসছিলঃ যে সকল অবস্থায় শারীয়ত প্রণেতা কুফ্‌র প্রকাশ করার অনুমোদন দিয়েছেন তা কি কি? -এর উত্তর প্রদান করব। এ ছাড়া উক্ত বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন মাসয়ালাহ এবং শাখা-প্রশাখার উত্তর প্রদান করব... ইনশাআল্লাহ।

আমরা আল্লাহ তায়ালার নিকট যথার্থতা, তাওফীক ও কবূলের আশা রাখি। কেননা নিশ্চয় তিনি মহান সর্বশ্রোতা,সদা নিকটবর্তী। সুতরাং উত্তরে আমি বলব ঃ শারীয়ত প্রণেতা সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নিয়মানুসারে এবং নির্ধারিত সীমারেখায় শুধুমাত্র[১] তিনটি স্থানে কুফ্‌র প্রকাশ করার অনুমোদন দিয়েছেন। আমরা এটাকে ব্যাখ্যা সহকারে এবং তাহক্বীক পূর্ণভাবে আলোচনা করব। (ইনশাআল্লাহ) নিম্নে এর বিবরণ প্রদত্ত হল...

আব্দুল মুনয়িম মুছত্বফা হালীমাহ্ আবূ বাছীর
১৪/৬/১৪২১ হিঃ

---

১ আমরা এখানে ঐ সকল স্থানের ইচ্ছা করছি না যেখানে উক্ত ব্যক্তির অজ্ঞতাকে ওযর হিসাবে দেখা হয়। এটার জন্য অন্য ক্ষেত্র ও অন্য আলোচনা রয়েছে। আমরা এখানে ঐ সকল অবস্থার বর্ণনা করতে চাচ্ছি যেখানে 'ওটা কুফ্‌রী' তা জানা সত্ত্বেও যদি কোন ব্যক্তি উক্ত কুফ্‌রী প্রকাশ করে তবে তার ক্ষেত্রে ওটাকে ওযর হিসাবে বিবেচিত হবে।

প্রথম অবস্থা

الإكراه (আল-ইকরাহ)–বাধ্য করা

বাধ্য করা হচ্ছেঃ শক্তির জোরে কোন মানুষকে কোন কিছু করতে, কিংবা কোন কিছু বলতে চাপ সৃষ্টি করা; অথচ শারীয়ত বিরোধী হওয়ার কারণে সে এটার প্রতি সন্তুষ্ট নয়।

সুতরাং কোন ব্যক্তিকে যদি কুফ্‌রী কথা,কিংবা কুফ্‌রী কর্ম করতে বাধ্য করা হয় – যেমন বাধ্য করার পরিস্থিতি সৃষ্টি করে তাকে ত্বগূতকে সিজদা করার নির্দেশ দেয়া হল, অথচ সে উক্ত বাধ্যকরণকে প্রতিহত করার জন্য কুফ্‌রী বাক্য উচ্চারণ, কিংবা কুফ্‌রী কাজ করা ব্যতীত অন্য কোন পথ খুজে না পায়, এমতাবস্থায় অন্তরে ঈমান ও ইয়াকীন দৃঢ় রেখে তার জন্য কুফরী বাক্য উচ্চারণ করা বৈধ।

এর সমর্থনে দলীল হচ্ছে মহান আল্লাহ তায়ালার বাণীঃ

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

যাকে বাধ্য করা হয় এবং তার অন্তর ঈমানে অটল থাকে সে ব্যতীত যে কেউ ঈমান আনয়নের পর আল্লাহতে অবিশ্বাসী হয় এবং কুফরীর জন্য মন উন্মুক্ত করে দেয় তাদের উপর আপতিত হবে আল্লাহর গযব এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। (সূরা নাহলঃ ১০৬)

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان،وما استكرهوا عليه

নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা আমার জন্য আমার উম্মাত থেকে ভুল-ভ্রান্তি এবং তারা তার উপর যা কিছু বাধ্য করে ঐ গুলোকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

(আহমাদ, ইবনে মাজাহ,আত-ত্বাবরানী,সাহীহুল জামি, ১৭৩১)

এছাড়া আম্মার (রাঃ) এর প্রসিদ্ধ ঘটনাও এর সমর্থনে একটি দলীল যখন মুশরিকরা তাকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে গালি দিতে এবং কুফরী বাক্য বলতে বাধ্য করেছিল এবং তাকে শাস্তি প্রদান করেছিল, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বললেনঃ

فكيف تجد قلبك؟ " قال أجد قلبي مطمئناً بالإيمان. قال: " فإن عادوا فعُد

"তোমার অন্তরকে তুমি কিরুপ পাচ্ছ? উত্তরে তিনি বলেনঃ অন্তর তো ঈমানে পরিপূর্ণ রয়েছে"। তিনি তখন বলেনঃ "তারা যদি তাদের কাজের পুনরাবৃত্তি করে তবে তুমিও তোমার একথার পুনরাবৃত্তি করবে।"

গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবার্তা

এখানে আমরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবার্তা সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরবঃ

১. প্রকৃত জবরদস্তি করার পরই কেবল কুফরী প্রকাশ করতে পারে, কিংবা প্রকৃতপক্ষেই বল প্রয়োগকৃত ব্যক্তির এমন প্রবল ধারণা হবে যাতে করে তার ধ্বংস, কিংবা হত্যা, কিংবা অঙ্গ প্রতঙ্গ কেটে ফেলা, কিংবা প্রকৃতক্ষেই প্রহার করা ইত্যাদির আশংঙ্কা করবে তবে এমতাবস্থায় কুফরী প্রকাশ করতে পারে।

ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন ঃ যে কোন ক্ষমতাধর ব্যক্তি যে আমাকে এমন কথা বলতে চাপ সৃষ্টি করে যা না বললে আমাকে এক বা দুইটি বেত্রাঘাত খেতে হবে, তবে আমি উক্ত কথা বলব।

কোন কোন আহলে ইলম সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) -এর ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন যে তার জন্য দুইটি বেত্রাঘাতই কঠিন ছিল এর ফলেই তার ধবংস হয়ে যাওয়ার আশংঙ্কা করা হত। কেননা তাঁর শরীর দুর্বল ছিল... আল্লাহই অধিক অবগত।

২. কুফরী হতে তার ই'তিকাদ নিরাপদ রেখে ঈমান ও ইয়াক্বীনে বিশ্বাসী হবে এভাবে যে যদি তার অন্তর প্রকাশ করা কুফরীর প্রতি আস্থাশীল হয় এবং এটাকে বিশ্বাস করে তবে সে সাথে সাথে কাফির হয়ে যাবে এবং মিল্লাত থেকে বের হয়ে যাবে। কেননা অন্তর বিশ্বাসের প্রতি স্বীকৃতি দেয়। কেননা সে যেটা ইচ্ছা করে না এবং যাতে সে সন্তুষ্ট নয় এমন জিনিসের উপর অন্তরকে বাধ্য করতে কোন সৃষ্টিই ক্ষমতা রাখে না।

৩. শাস্তি, কিংবা কষ্টকে প্রতিহত করা যায় এই পরিমাণ কুফরী প্রকাশ করা বৈধ। এর থেকে একটুও বেশী করা যাবে না। প্রয়োজন ব্যতীত কুফরী প্রকাশ করার ক্ষেত্রে শিথিল এবং প্রসার ঘটানো উক্ত ব্যক্তিকে নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত করে দেয় এবং কখনও কখনও কুফর-এর মধ্যে ঠেলে দেয়। উদাহরণস্বরুপ বলা যায় ঃ যদি তার থেকে শুধুমাত্র দ্বীনকে গালি দিতে বলা হয়, তখন সে আরো কিছু বৃদ্ধি করে বলল। অতঃপর সে দ্বীন,রব্ব সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এবং নাবী (সাঃ) সহ সকল মুসলিমকে গালি দিল.. ফলে এমন বিস্তৃতি অবস্থায় উক্ত ব্যক্তির বল প্রয়োগের অভিযোগ গ্রহণীয় হবে না। কেননা কুফরীর উক্ত বর্ধিত অংশ তাকে বাধ্য করা ছাড়াই বৃদ্ধি করেছে, তাকে এমনটি বলতে বলা হয়নি!।

৪. 'বাধ্য করা' অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই যদি পলায়ন, কিংবা হিজরত এবং এরুপ অন্য কিছু দ্বারা কুফরীতে লিপ্ত হওয়া থেকে পরিত্রাণ পেতে সক্ষম হয়.. অতঃপর দা'ওয়াহ (দ্বীনের প্রচার) কিংবা দুনিয়া ও তার মজাকে প্রাধান্য দেয়ার কারণে হিজরত করল না...এমতাবস্থায় বাধ্য করার অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা এটা তার ইচ্ছায় অর্জিত হয়েছে এবং এটাকে প্রতিহত করার সম্ভাবনাময়

অবস্থায় এবং এতে লিপ্ত না হতে পারা অবস্থায় সংঘটিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ فاتقوا الله ما استطعتم

অর্থ তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর। (সূরা তাগাবূনঃ ১৬)

তিনি আল্লাহ তায়ালা আরও বলেছেনঃ

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا

যারা নিজের অনিষ্ট করে, ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করে বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে ? তারা বলেঃ এ ভূখন্ডে আমরা অসহায় ছিলাম। ফেরেশতারা বলেঃ আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা হিজরত করে সেখানে চলে যেতে? অতএব এদের বাসস্থান হল জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত মন্দ স্থান। কিন্ত পুরুষ, নারী ও শিশুদের মধ্যে যারা অসহায়, তারা কোন উপায় করতে পারে না এবং পথও জানে না। অতএব, আশা করা যায়, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। (সূরা নিসাঃ ৯৭-৯৯)

আল্লাহ তায়ালা বর্ণনা করেছেন যে, নিশ্চয় ঐ সমস্ত লোক যারা এমন অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে হিজরত করতে পারত যে সকল অবস্থায় তাদেরকে নাবী (সাঃ) এবং তার সঙ্গী একত্ববাদী মুমিনদের বিরুদ্ধে বদরের প্রান্তরে মুশরিকদেরকে সাহায্য করতে এবং তাদের দল ভারী করতে বাধ্য করা হয়েছিল। তাদের পক্ষ থেকে জবরদস্তী ও অসহায়-এর দাবী করার অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না - পক্ষান্তরে ঐ সকল প্রকৃত অসহায় ও দুর্বল ব্যক্তি যারা বাধ্য করার অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে কোন উপায় করতে পারে না এবং কোন পথও জানে না। অতএব, আশা করা যায়,আল্লাহ তাদেরকে মার্জনা করবেন এবং ক্ষমা করবেন - যদি ও তাদেরকে কুফরী প্রকাশ করতে বাধ্য করা হয়ে থাকে।

এমনিভাবে আল্লাহ তাকে যালেম ত্বগূতদের থেকে নিরাপদ রাখার পরও যদি সে যালিম ত্বগূতদের দেশে অবস্থান করাকে নিজের জন্য বেঁছে নেয় অথচ সে পূর্বেই অবগত যে অচিরেই সে এমন অবস্থার মুখোমুখি হতে যাচ্ছে যেখানে তাকে কুফরী প্রকাশ করতে বাধ্য করা হবে ... অতএব, যদি সে তখন কুফরী প্রকাশ করে তবে তার পক্ষ থেকে বাধ্য করার কৈফিয়াত গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা সে নিজেই তো কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ কিংবা কোন শারয়ী কারণ ব্যতীতই এটাকে পছন্দ করেছে এবং এর দিকে ধাবিত হয়েছে!!

উক্ত আলোচনার মধ্যে ঐ সকল লোকদের জন্য উপদেশ রয়েছে যারা দেশ ও বাসস্থানের টানে হিজরত করা এবং হিজরতের দেশে আল্লাহ তায়ালা তাদের উপর যে সকল প্রচুর কল্যাণ ও রূযীর প্রাচুর্য্য দান করেছেন তা থেকে বিরত হয়েছে। ফলে তারা অত্যাচারী ত্বগূতদের কষ্টের উপরে নিজেদেরকে ভেঙ্গে ফেলেছে এবং নিক্ষেপ করেছে; যারা তাদের কাছে ক্ষমা ও দয়া ছাড়াও ইত্যাদি লাঞ্চনা ও অপমান প্রার্থনা করে ও নবায়ন করে... অতএব ঐ সকল লোকেরা ত্বগূত ও তার সাহায্যকারীদের কোলে অবতরণ কিংবা পতিত হওয়ার পর তাদেরকে কুফরী প্রকাশ করতে বাধ্য করা হলে তাদের পক্ষ থেকে জবরদস্তী করার অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না।

এমনিভাবে স্ব-ইচ্ছায় যারা ত্বগূতী আইন রচনা পরিষদকে বেঁছে নেয় এমতাবস্থায় যদি পরিস্থিতি তাদেরকে কোন কুফরী প্রকাশ করতে বাধ্য করে তখন তাদের পক্ষ থেকে 'বাধ্য করা'-এর অভিযোগ গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন ঃ জাহেলী সংবিধানকে সম্মান করার জন্য এবং ত্বগূত শাসকের আনুগত্যে প্রবেশ করার জন্য শপথ করা ইত্যাদি... আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৫. বল প্রয়োগকৃত ব্যক্তির জন্য সমপরিমাণ কিংবা তদপেক্ষা বেশী অনিষ্ট দ্বারা নিজের অনিষ্টকে দূর করা বৈধ নয়। যেমন, স্বীয় মুসলিম ভাইকে হত্যা করার মাধ্যমে নিজে নিহত হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া। কেননা সে নিজে তার অন্য মুসলিম ভাই থেকে উৎকৃষ্ট নয়।

এমনিভাবে যদি তাকে নিজে নিহত হওয়া কিংবা স্বীয় মুসলিম ভাইকে হত্যা করার মধ্যে স্বাধীনতা দেয়া হয়, তবে কখনোই স্বীয় মুসলিম ভাইকে হত্যা করা বৈধ নয়। যদিও স্বীয় গর্দানকে যবেহ কিংবা ফাঁসির জন্য উৎসর্গ করতে হয়। তদ্রূপ যদি কোন বন্দীকে ত্বগূতদের জেলখানায় চরম নির্যাতন চালানো হয়, তবে তার জন্য এটা বৈধ হবে না। তার উপর নির্যাতন ও কষ্ট যতই করা হোক না কেন তার মুসলিম ভাই -এর স্থান বলে দেয়া - যদি সে অবগত হয় যে বলে দেয়ার ফলে উক্ত ভাইকে গ্রেফতার করে ধবংস কিংবা মেরে ফেলা হবে।

আশ-শায়বানী 'আস-সিয়ার'-এর ৪/২৫৪-এর মধ্যে বলেছেনঃ যদি তারা কোন মুসলিম বন্দীকে বলে ঃ আমাদের সন্তুষ্টির জন্য উক্ত মুসলিম বন্দীকে হত্যা কর; নচেৎ আমরা তোমাকে হত্যা করব। তবে তার জন্য তাকে হত্যা করার কোন সুযোগ নেই। কেননা (সাহাবীদের) আছারে বর্ণিত হয়েছেঃ 'হত্যার মধ্যে কোন তুক্বইয়া (প্রতিরক্ষা) নেই'। এমনিভাবে যদি তারা উক্ত মুসলিম বন্দীর দুই হাত, কিংবা দুই পা বাঁধতে বলে যদিও তলোয়ার দ্বারা প্রহার কারীর হাত দূর্বল হয়ে থাকে ফলে তাকে বলা হলঃ তুমি তোমার হাত দ্বারা তার উভয় হাত ধরে রাখ, যেন

আমরা তাকে প্রহার করতে পারি। আর তুমি যদি আমাদের কথা না মান তবে আমরা তোমাকে হত্যা করব; এটা করার কোন অবকাশ তার নেই...।

আর যদি তাদের নিকট থেকে কোন বন্দী পালিয়ে যায়, তখন তারা অন্য এক বন্দীকে বলল, যে তার স্থান চেনেঃ তার ঠিকানা বলে দাও যেন আমরা তাকে হত্যা করতে পারি; নচেৎ আমরা তোমাকে হত্যা করব; তবে তাদেরকে তার ঠিকানা বলে দেয়ার কোন অনুমতি নেই।

উক্ত আলোচনার দ্বারা আমরা সতর্ক করে দিতে চাই যে, আমরা অনেক সময় তুগূতদের জেলখানায় বিপদগ্রস্থ কোন বন্দী ভাইকে জাল্লাদের কয়েকটি চাবুকের আঘাতেই ভেঙ্গে পড়তে দেখেছি এবং স্বীয় ভাইদের নাম, ঠিকানা বলে দিতে দেখেছি। অথচ তিনি পূর্বেই এটা অবগত আছেন যে, ওটা তাদেরকে হত্যা এবং ফাঁসির মঞ্চে পৌঁছিয়ে দেবে... যদি তাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হয় তখন আপনি তাকে দেখবেন নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করছে এবং সে বলছে যে, সে বাধ্য হয়ে এবং শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য এটা করেছে!!।

পূর্বের আলোচনার উত্তর হচ্ছেঃ নিশ্চয় তার জীবন তার ভাইদের জীবন থেকে বেশী সম্মানী ও মূল্যবান নয়; ফলে তার ভাইদের জানকে মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে নিজের জান রক্ষা করা বৈধ হবে না।

আর যদি সে এমনটি করেই ফেলে, তবে সে গুনাহগার হবে... এমতাবস্থায় তার উপর ওয়াজিব হচ্ছে ধৈর্যধারণ করা এবং ছওয়াবের আশা রাখা। আর আল্লাহই অধিক অবগত।

৬. যদি তাকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মুশরিক বাহিনীর সাথে বের হতে বাধ্য করা হয়, তবে বাধ্যকৃত ব্যক্তির জন্য মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বৈধ নয়। যদি ও পরিণামে তাকে নিহত কিংবা জেলে যেতে হয়। আর যখন কোন ব্যক্তি মুসলিমদের মধ্যে পরস্পরে ফিতনার যুদ্ধের সময় অবস্থান করবে তখন তার জন্য এক দলের বিপরীত অন্য দলের সঙ্গী হয়ে যুদ্ধ করা বৈধ নয় – যদি ও পরিণামে তাকে নিহত হতে হয়। যেমন নবী (সাঃ) থেকে বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি ফিতনার যুদ্ধের সময় কিছু কিছু সাহাবীকে কাঠ দ্বারা নির্মিত তরবারী ধারণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

যখন মুসলিমদের মধ্যে বিষয়টি ঐরূপ, তখন অগ্রাধিকারভাবে একজন মুসলিমের উচিত হবে ঈমানদার ও তাওহীদবাদীদের বিপরীত মুশরিক এবং নাস্তিকদের সঙ্গী হয়ে যুদ্ধ করা থেকে দূরে থাকা। যদি ও পরিণামে তাকে নিহত হতে হয় এবং জেলে যেতে হয় এবং তার নাম বিদ্রোহী সেনাদের তালিকাভুক্ত করা হয়, কিংবা সেনাদের সাথে বড় বিশ্বাসঘাতক হিসাবে চিহ্নিত হয়, যা বর্তমান যুগে বহুলপ্রচলিত বিষয়।!

এ ক্ষেত্রে ঐ সকল সেনাদেরকে সতর্ক করার দাবী রাখে যে, যাদেরকে ত্বগূতের নিকট বর্তমানে কিছু কিছু কাফির সেনাবাহিনীর মধ্যে কাজ করতে বাধ্য করা হয়, যারা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও শত্রুতায় লিপ্ত..... তাদের জন্য কোন ক্রমেই নেতাদের আনুগত্য করে তাদের নির্দেশ বাস্তবায়ন করা বৈধ নয়। ফলশ্রুতিতে একত্ববাদী মুসলিমদের ঘরবাড়িতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের বন্দী করা হয় এবং তাদের সন্তান ও নারীদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করা হয়, কিংবা তাদেরকে হত্যা করা হয়, তাদের সাথে যুদ্ধ করা হয় কিংবা তাদেরকে বিভিন্ন প্রকার কষ্ট দেয়া হয় এবং তাদের সাথে বাড়াবাড়ি করা হয় – যদি ও পরিণামে তাকে জেলে যেতে হয়, কিংবা নিহত হতে হয়।

৭. নিশ্চয় যে ব্যক্তিকে কুফরী প্রকাশ করতে বাধ্য করা হবে তাঁর জন্য উত্তম ও ভাল হবে যে তিনি ধৈর্যধারণ করবেন এবং দৃঢ়ভাবে অটল থাকবেন এবং কুফরী প্রকাশ করবেন না- যদিও এটা তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়; বিশেষ করে যদি তিনি আলেম হন এবং অন্যদের জন্য আদর্শ-স্বরূপ হন এবং নেতৃত্ব পর্যায়ের হয়ে থাকেন।

যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছেঃ

عن أبي الدرداء قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم: " أن لا تُشرك بالله شيئاً وإن قُطعت أو حُرِّقت..".

আবূ দারদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার বন্ধু (সাঃ) আমাকে ওয়াছিয়াত করেছেন যে, তুমি আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে অংশীস্থাপন করবে না– যদি ও তোমাকে কেটে টুকরা টুকরা করা হয়, কিংবা জ্বালিয়ে দেয়া হয়।

(ইবনে মাজাহ, বায়হাকী, সহীহুত-তারগীব, ৫৬৬)

রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেছেনঃ

ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان " منها " أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يُقذف في النار " متفق عليه

যার মধ্যে তিনটি বিষয় থাকবে তবে সে ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পাবে। একটি হচ্ছেঃ সে কুফরীতে ফিরে যেতে ঐরুপ অপছন্দ করবে, যেমন যে অগ্নীতে নিক্ষিপ্ত হতে অপছন্দ করে। (বুখারী, মুসলিম)

এমনিভাবে সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফাহ সাহমী (রাঃ) -এর সঙ্গে সীমালঙ্ঘণকারী রোম সম্রাট -এর যে ঘটনা ঘটেছিল। ঘটনাটি হচ্ছেঃ অত্যাচারী তাঁকে বললঃ তুমি কি খ্রীষ্টান হয়ে আমার রাজ্যে ও রাজত্বে অংশগ্রহণ করতে পার?! আবদুল্লাহ (রাঃ) তাকে উত্তরে বললেনঃ আপনি যদি আপনার রাজা ও আরবদের মালিকানাধীন সবকিছু এই শর্তে ছেড়ে দেন যে, মুহূর্তের তরে মুহাম্মদ (সাঃ) এর দ্বীন হতে ফিরে আসব, তবে, আমার পক্ষে তা অসম্ভব! বাদশাহ বললঃ তবে আমি তোমাকে হত্যা করব। উত্তরে তিনি বললেনঃ এটা আপনার ব্যাপার!

অতঃপর সে নির্দেশ প্রদান করল এবং তাকে শূলে চড়ানো হল। এবং সে তীর নিক্ষেপকারীদের বললঃ তোমরা তার উভয় হাতের নিকট দিয়ে এবং উভয় পায়ের পাশ দিয়ে তীর ছুড়বে। আর সে তাঁর কাছে উক্ত প্রস্তাব পেশ করছিল, আর তিনি তা প্রত্যাখ্যান করছিলেন.....

অতঃপর তার নির্দেশে তাঁকে নামানো হল। অতঃপর একটি ডেক আনতে বলল। তাতে পানি ঢেলে প্রচন্ড গরম করা হল। অতঃপর দুইজন মুসলিম বন্দীকে ডেকে এনে তাদের একজনের ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করল, ফলে তাকে উক্ত ডেকে নিক্ষেপ করা হল; আর সে তার কাছে খ্রীষ্টান হওয়ার প্রস্তাব দিচ্ছিল, আর তিনি অস্বীকার করছিলেন। অতঃপর তাঁর সম্পর্কে তাতে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিল।

যখন তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন তিনি কেঁদে ফেললেন। তখন বাদশাহকে বলা হলঃ তিনি তো কেঁদে ফেলেছেন। তখন সম্রাট ধারণা করল যে ভয় পেয়েছে। অতঃপর সে তাঁকে ফিরে আনার নির্দেশ দিল এবং তাঁকে খ্রীষ্টান হওয়ার প্রস্তাব পেশ করল। আর তিনি অস্বীকার করে যাচ্ছিলেন।

তখন সম্রাট তাঁকে জিজ্ঞেস করল, তুমি তখন কাঁদছিলে কেন? উত্তরে তিনি বললেনঃ এ জন্যই কাঁদছিলাম যে,আমি মনে মনে বলছিলামঃ তোমাকে এখন উক্ত ডেকে নিক্ষেপ করা হচ্ছে, আর তুমি তো চলে যাচ্ছ।

তখন আমি এই আকাঙ্খা করছিলাম যে,যদি আমার শরীরের কেশ পরিমান আমার জান হত এবং প্রত্যেকটি আল্লাহর সন্তুষ্টিতে নিক্ষিপ্ত হত, তবে কতইনা ভাল হত!! অত্যাচারী তখন তাঁকে বললঃ তুমি কি আমার মাথায় চুম্বন করবে, তবে আমি তোমাকে মুক্তি দিব? উত্তরে আবদুল্লাহ (রাঃ) তাকে বললেনঃ সকল মুসলিম বন্দীকে মুক্তি দিবেন? উত্তরে সম্রাট বললঃ হ্যাঁ সকল মুসলিম বন্দীকে মুক্তি দিব।

আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেনঃ তখন আমি মনে মনে ভাবলামঃ সে তো আল্লাহর একজন দুশমন। আমি তার মাথায় চুম্বন করব, ফলে সে আমাকে ও সকল মুসলিম বন্দীকে মুক্তি দিবে।

অতএব, কোন পরোয়া নেই। অতঃপর তিনি তার নিকটবর্তী হয়ে তার মাথায় চুম্বন করলেন। ফলে সম্রাট তার নিকট বন্দীদেরকে সমর্পণ করল। তখন তিনি তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে উমার (রাঃ)-এর কাছে আগমন করলেন এবং স্বীয় ঘটনার বিবরণ দিলেন। ঘটনা শ্রবন করে উমার (রাঃ) বললেনঃ প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব হচ্ছে আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফাহ (রাঃ)-এর মত মস্তক চুম্বন করা। আর আমি শুরু করছি এই বলে তিনি তাঁর মাথায় চুমু খেলেন।

উমার (রাঃ) ও তাঁর সঙ্গী অন্যান্য সাহাবীদের পক্ষ থেকে উক্ত উত্তম বিবেচনা করা সঠিক ইজমা হিসাবে গণ্য করা যায়- যে আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফাহ (রাঃ)-এর অবস্থান উত্তম বিবেচনা করার ক্ষেত্রে কোন বিরোধী আছে বলে জানা যায় না। উক্ত সম্ভ্রান্ত সাহাবী যে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন সেটাই উত্তম ও শ্রেয়। আল্লাহ তায়ালাই অধিক অবগত।

দ্বিতীয় অবস্থা

التُقية (আত-তুক্বয়াহ্) প্রতিরক্ষা বা আত্মরক্ষা

প্রতিরক্ষা বা আত্মরক্ষা হচ্ছেঃ জান ও পরিবার-এর উপর আশংঙ্কা থাকার কারণে কাফির ও মুশরিকদের সাথে অন্তরে২ শত্রুতা ও বিদ্বেষ গোপন রেখে মৌখিকভাবে তাদের জন্য বন্ধুত্ব ও কোমল আচরণ করা।

নিঃসন্দেহে মুশরিকদের জন্য মৌখিকভাবে বন্ধুত প্রকাশ করার কিছু কিছু দিক কুফ্‌র হয়ে থাকে এবং উক্ত ব্যক্তিকে কাফির হিসাবে আখ্যায়িত করা হবে, যদি সে এটা তুক্বইয়া (প্রতিরক্ষা) কিংবা গ্রহণযোগ্য আশঙ্কা ব্যতীত অন্য কোন কারণে প্রকাশ করে থাকে।

এর প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার বাণীঃ

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

মুমিনগণ যেন অন্য মুমিনকে ছেড়ে কোন কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে আল্লাহর সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে অনিষ্টের আশঙ্কা কর, তবে তাদের সাথে সাবধানতার সাথে থাকবে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করছেন এবং সবাইকে আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে। *(সূরা আল-ইমরানঃ ২৮)*

ইবনে জারীর ত্বাবরী (রঃ) তাফসীরের ৩/২২৭-এর মধ্যে বলেছেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে ঃ হে মুমিনগণ তোমরা কাফিরদেরকে এভাবে সাহয্যকারী হিসাবে গ্রহণ কর না যে, ধর্মের ব্যাপারে তাদেরকে সমর্থন করবে, মুমিনদের পরিবর্তে মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করবে এবং মুমিনদের

---

২ মুনাফিকের বিপরীতঃ কেননা সে ঈমানদারদের নিকট কুফর ও শত্রুতা গোপন করে, সাথে সাথে মৌখিকভাবে মুমিনদের জন্য ঈমান ও বন্ধুত্ব প্রকাশ করে... ফলে যে মুমিন প্রতিরক্ষার কারণে তার প্রকাশ্য দিক অন্তরের বিপরীত হয়ে যায় শুধুমাত্র এই কারণে তার উপর কপটতা, কিংবা মুনাফিকের হুকুম লাগানো হবে না। অতএব, প্রত্যেক আভ্যন্তরিণ বিষয় হতে বাহ্যিক বিপরীত বিষয় মুনাফিকী থেকে নয়, কিংবা উক্ত ব্যক্তি মুনাফিক নয়। সুতরাং এ বিষয়ে সতর্ক থাকুন!

লজ্জাজনক বিষয় তাদেরকে জানিয়ে দিবে। কেননা যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ "তবে আল্লাহর সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না।" অর্থ্যা এর ফলে সে স্বীয় দ্বীন থেকে মুর্তাদ হওয়ার কারণে এবং কুফরীতে প্রবেশ করার ফলে অবশ্যই আল্লাহর থেকে সম্পর্কহীন হয়ে যাবে এবং আল্লাহ ও তার থেকে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবেন। "তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে অনিষ্টের আশঙ্কা কর, তবে তাদের সাথে সাবধানতা অবলম্বন করবে"। অর্থ্যা যদি তোমরা তাদের দাপটের মধ্যে থাক এবং তোমরা নিজেদের প্রতি তাদের ব্যাপারে আশঙ্কা কর, তবে তোমরা মৌখিকভাবে তাদের জন্য বন্ধুত্ব প্রকাশ করবে, অন্তরে শত্রুতা রাখবে, তারা যে কুফরীতে রয়েছে এজন্য তাদেরকে সমর্থন করবে না এবং কোন কর্মের দ্বারা কোন মুসলিমের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করবে না।

সুদ্দী থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেনঃ "তাদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষামূলক" এটা হচ্ছে সে তাদের উদ্দেশ্যে তাদের ব্যাপারে বন্ধুত্ব প্রকাশ করবে এবং মুমিনদের থেকে সম্পর্কহীনতা প্রকাশ ঘটাবে।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে আরও বর্ণিত আছেঃ মৌখিকভাবে প্রতিরক্ষা হচ্ছে, কোন ব্যক্তিকে কোন কিছু বলতে প্ররোচিত বা বাধ্য করল, অথচ এটা আল্লাহর নাফরমানীর কাজ। তখন সে জীবনের ভয়ে ওটা বলল; অথচ তার অন্তর ঈমানে অটল, তবে তার কোন গুনাহ হবে না। প্রতিরক্ষা তো শুধুমাত্র মৌখিকভাবে হয়ে থাকে।

إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً -"তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে অনিষ্টের আশঙ্কা কর, তবে তাদের সাথে সাবধানতা অবলম্বন করবে" ইকরামা থেকে উক্ত আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ যতক্ষণ পর্যন্ত কোন মুসলিমের রক্ত প্রবাহিত না করা হবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তার সম্পদ হালাল না মনে করা হবে।

ইবনে কাছীর (রঃ) স্বীয় তাফসীরে বলেনঃ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً

"তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে অনিষ্টের আশঙ্কা কর, তবে তাদের সাথে সাবধানতা অবলম্বন করবে"। অর্থ্যাৎ যে ব্যক্তি কোন দেশে এবং কোন সময়ে তাদের পক্ষ থেকে অনিষ্টের আশঙ্কা করবে, তবে তার জন্য প্রকাশ্যভাবে প্রতিরক্ষা করার অনুমোদন রয়েছে – অন্তর দিয়ে এবং নিয়াত দ্বারা নয়। যেমন ইমাম বুখারী (রঃ) আবূ দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন,

তিনি বলেছেনঃ নিশ্চয় আমরা অনেক সম্প্রদায়ের মুখের সামনে দাঁত বের করে হাসি, অথচ আমাদের অন্তর তাদের প্রতি লা'নত করে।

ছাওরী বলেছেনঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ কর্মের দ্বারা তুক্বইয়া (প্রতিরক্ষা) নয়। প্রতিরক্ষা তো মৌখিকভাবে হয়ে থাকে। এমনিভাবে আওফী ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ প্রতিরক্ষা তো মৌখিকভাবে হয়ে থাকে। আবুল আলিয়া, আবূ শা'ছা', যাহ্হাক এবং রবী ইবনে আনাস অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।

ইমাম বুখারী (রঃ) বলেছেনঃ হাসান (রঃ) বলেছেনঃ তুক্বইয়া (প্রতিরক্ষা) কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। অর্থ্যৎ যখন এর কারণ ও হেতু বিদ্যামান থাকবে।

আমার বক্তব্য হচ্ছেঃ প্রতিরক্ষা বা আত্মরক্ষাকারী ব্যক্তি হচ্ছেন ঐ সকল লোক, যারা দেশে অসহায় ও দুর্বল। যারা 'আত্মরক্ষা করার স্থান' তথা কুফ্‌র যুলমও নির্যাতনের দেশ থেকে বের হওয়ার কোন উপায় করতে পারে না এবং কোন পথও জানে না। ফলে তারা তুক্বইয়া বা আত্মরক্ষার নীতির শরণাপন্ন হয়। যেমন নিজেদের জন্য নিশ্বাস নেয়ার জায়গা এবং মূলোৎপাটন কিংবা নিহত হওয়ার মুখোমুখি না হয়ে স্বীয় জান ও অস্তিত্ব রক্ষা করা .....

আল্লাহ তায়ালার অত্র আয়াতে ওদেরকেই বুঝানো হয়েছেঃ

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا

فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا

কিন্তু পুরুষ, নারী ও শিশুদের মধ্যে যারা অসহায়, তারা কোন উপায় করতে পারে না এবং পথও জানে না। অতএব, আশা করা যায়, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।

(সূরা নিসাঃ ৯৮, ৯৯)

অতএব, প্রতিরক্ষা হচ্ছে ঐ সকল লোকদের জন্য। এটা এমন ক্ষমতাবান লোকদের জন্য নয় যারা কোন উপায় করতে পারে এবং পথও জানে।

<u>যদি প্রশ্ন করা হয়ঃ প্রতিরক্ষা তো বাধ্যকরার একটি প্রকৃতি! অতএব এটাকে দ্বিতীয় অবস্থায় অর্থাৎ যে সকল অবস্থায় কুফরী প্রকাশ করা বৈধ –এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করলেন কেন ?</u>

এর উত্তরে আমি বলবঃ হ্যাঁ প্রতিরক্ষা বাধ্যকরারই একটি অবস্থা হয়ে থাকে। কিন্তু এটা 'ইকরাহ' বা বাধ্যকরা থেকে দুই দিক দিয়ে ভিন্ন হয়ে থাকেঃ

প্রথমতঃ বাধ্য করা তো মৌখিকভাবে এবং কর্মগত উভয়ভাবেই হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে প্রতিরক্ষা শুধুমাত্র মৌখিকভাবে হয়ে থাকে। যেমন ইতিপূর্বে আলেমদের পক্ষ থেকে এটা বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তিকে শক্তি দ্বারা এবং সরাসরি অপছন্দনীয় কোন কাজ করতে বাধ্য করা হয়, তবে এমতাবস্থায় এটা প্রতিরক্ষার অবস্থা থেকে বেরিয়ে বাধ্য করার অবস্থায় রূপান্তরিত হয়ে যায়।

দ্বিতীয়তঃ নিশ্চয় স্থান, কালভেদে বাধ্য করার পরিধি, এটা প্রতিরক্ষা অবলম্বন করার পরিধি থেকে অধিকতর সীমাবদ্ধ। সুতরাং বাধ্য করার অবস্থা হচ্ছেঃ কোন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট স্থানে এবং নির্দিষ্ট সময়ে অপছন্দনীয় কোন কাজ করতে, কিংবা কোন কিছু বলতে বাধ্য করা। অতএব, যখন উক্ত সময় শেষ হয়ে যাবে এবং উক্ত অবস্থার সমাপ্তি ঘটবে তখন বাধ্য করার ঐ অবকাশ ও শেষ হয়ে যাবে যে জন্য কুফরী প্রকাশ করা, কিংবা শারীয়াত বিরোধী কর্ম করার জন্য তাকে নির্দোষ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়।

পক্ষান্তরে প্রতিরক্ষাঃ স্থান ও কালভেদে -এর পরিধি ব্যাপক। এটা ঐ সকল সময়ের পরিধিকে গণ্য করবে। যেখানে কোন মুসলিম প্রতিরক্ষা ও যুলম এর স্থানে নিরুপায় অবস্থায় অবস্থান করে। যখনই অবস্থা তাকে বাধ্য করবে তখনই সে জাতির অনিষ্টকে নিজের থেকে হঠানোর জন্য এর আশ্রয় নিতে পারে।

আর কখনো কখনো তুক্বইয়া (প্রতিরক্ষা) ইকরাহ্ (বাধ্য করা) থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। এমনিভাবে ইকরাহ্ (বাধ্য করা) প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে এবং তাৎক্ষণিক এর শাস্তি হয়ে থাকে।.....

পক্ষান্তরে তুক্বইয়া (প্রতিরক্ষা)ঃ কখনো কখনো পরোক্ষভাবে প্রতিরক্ষার মধ্যে বাধ্য করার উপাদান পাওয়া যায়। আর এর শাস্তি কখনো কখনো ঘটনার অনেক পরে হয়ে থাকে যালেমরা যে ব্যক্তিকে পর্যবেক্ষণ করছে এবং যার ব্যাপারে তথ্য অনুসন্ধান করছে যখন তাদের নিকট এ রকম সকল তথ্য ও সংবাদ একত্রিত হবে তখন তারা তাকে শাস্তি দিয়ে থাকে। আর এটাই হচ্ছে তুক্বইয়া এবং ইকরাহের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য।

সতর্কবার্তা ও নীতিমালাঃ

১. পূর্বের আলোচনার মাধ্যমে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে তুক্বইয়া অবলম্বন করার সুযোগ এমন ব্যক্তির জন্য রয়েছে যে তুক্বইয়ার অঞ্চলে সত্য প্রকাশ করতে অপারগ এবং সে উক্ত অঞ্চল -এর অধিবাসীদের দাপট থেকে বের হয়ে আসতেও অক্ষম। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সত্য প্রকাশ করতে সক্ষম, কিংবা তুক্বইয়া ও ভীতির অঞ্চল থেকে বের হয়ে আসতে সক্ষম, তবে তার জন্য তুক্বইয়ার নীতি অবলম্বন করার কোন অবকাশ নেই।

২. তুক্বইয়া হচ্ছে মুশরিকদের সাথে অন্তরে শত্রুতা ও ঘৃণা গোপন রেখে এবং কোন মুসলিমের বিরুদ্ধে কোনভাবে তাদেরকে সাহায্য না করে মৌখিকভাবে তাদের সাথে সৌজন্য আচরণ করা এবং বন্ধুত্ব রাখা।

৩. তুক্বইয়া এই পরিমান হতে পারে যার মাধ্যমে জাতির কষ্টকে প্রতিহত করা যায়। উদাহরণস্বরুপ বলা যায়, যখন জাতির অনিষ্টকে পাঁচটি কথার দ্বারাই প্রতিহত করা যায়, তখন তার জন্য এর বেশী বলা বৈধ নয় যে সে তাদেরকে দশটি কথা বলে দিবে।

৪. কোন ব্যক্তির জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে যালেম ও তাদের গোয়েন্দাদের দৃষ্টি থেকে দূরবর্তী নিজস্ব কোন বিশেষ বৈঠকে তাদের জন্য বন্ধুত্ব প্রকাশ করবে, অতঃপর দাবী করবে যে, এটা তুক্বইয়ার নীতি থেকে করা হয়েছে।

৫. তুক্বইয়ার অঞ্চল হচ্ছে যুলুম এর অঞ্চল। এটা দারুল কুফর এবং দারুল হারব হওয়া আবশ্যক নয়। যেমন এটা কোন কোন আব্বাসী শাসকদের যুগে খালকে কুরআন (আল কুরআন সৃষ্টি)-এর মাসয়ালার ফিতনার সময় সংঘটিত হয়েছিল। শাসকবর্গ সেটার সমর্থন করেছিল যেখানে গ্রহনযোগ্য অনেক আলেম নিরবতা অবলম্বন করেছিলেন এবং তুক্বইয়ার নীতি অবলম্বন করে বলেছিলেন যে আল-কুরআন হচ্ছে মাখলুক (সৃষ্টি); যেন তারা তলোয়ার ও নিহত হওয়া থেকে নিজেদেরকে আত্মরক্ষা করতে পারে। পক্ষান্তরে ইমাম আহমাদ (রঃ) আযীমাত তথা দৃঢ়তার নীতি গ্রহণ করেছিলেন এবং আল্লাহ তায়ালা তাঁর দ্বারা এবং তাঁর উপরে সত্য প্রকাশ করে দিয়েছিলেন।

এ প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, যখন পরীক্ষার সময় ইমাম আহমাদকে প্রহার করা হয়েছিল, তখন বিশর ইবনে হারিছ-এর সঙ্গীগণ তাকে বললেনঃ

হে আবূ নাছর! যদি আপনি বের হয়ে যেতেন। তখন আমি বললামঃ নিশ্চয় আমি আহমাদ ইবনে হাম্বল এর কথার উপরে রয়েছি! বিশর বললঃ তোমরা কি চাচ্ছ যে আমি নাবীদের স্থানে দাঁড়িয়ে যাই...

আল্লাহ তায়ালা আহমাদকে অগ্রে ও পশ্চাতে হিফাযত করেছেন। অর্থাৎ ইমাম আহমাদ নাবীদের স্থানে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন যখন তিনি আযীমাত তথা দৃঢ়তার নীতি গ্রহণ করেছেন এবং সত্য প্রচার করেছেন। আর আমি তো উক্ত স্থানে পৌঁছার ক্ষমতা রাখি না... অতএব, আপনি এ বিষয়ে চিন্তা -ভাবনা করুন!!

এমনিভাবে প্রত্যেক দারুল কুফর তুক্বইয়া ও ভীতির অঞ্চল নয় যে এখানে কোন মুসলিম কুফরী প্রকাশ করলে, কিংবা তুক্বইয়ার চর্চা করলে তাকে নির্দোষ বলা হবে। বিশেষ করে যে দারুল কুফরে তাদের ও মুসলিমদের মধ্যে শান্তি চুক্তি বিদ্যমান; যার ফলে সে তথায় স্বীয় দ্বীন প্রকাশ করতে এবং দ্বীনের প্রতি স্বাধীনভাবে আহ্বান করতে সক্ষম হয়। যেমন এটা কিছু কিছু পশ্চিমা দেশে দেখা যায়।

যেমন এটা সাহাবীদের ক্ষেত্রে হাবশায় হিজরত করার সময় দেখা গিয়েছিল। অথচ এটা দারুল কুফর ছিল। তবে এটা তুলনামূলকভাবে তাদের জন্য দারুল আমান ছিল; যেখানে তারা স্বীয় দ্বীন ও তাদের দাওয়াত প্রকাশ করতে সক্ষম হত!

ফলে উক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়ঃ শুধুমাত্র দারুল কুফরে মুসলিমদের অবস্থান করলেই ভয়াবহ বিপদাশঙ্কার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে এবং যুলুম - এর মধ্যে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকতে পারে - এর প্রতি লক্ষ্য না করে এবং উক্ত যুলুম ও এর আকার ও ধরনের প্রতি দৃষ্টি না দিয়েই তুক্বইয়ার নীতি গ্রহণ করা আবশ্যক নয়।

৬. উক্ত আলোচনার মাধ্যমে আহলুস-সুন্নাহর নিকট গ্রহণযোগ্য শারীয়াত সম্মত তুক্বইয়া নীতি এবং শীয়া রাফেযীদের ব্যবহৃত বিদয়াতী তুক্বইয়া নীতির মধ্যে পার্থক্য জানা যাচ্ছে; যার আশঙ্কা থাক আর না থাক যারা জনগণের নিকট এবং সাধারণ মুসলিমদের নিকট তুক্বইয়ার মাধ্যমে মিথ্যা বলাকে হালাল বলে জানেন।

তৃতীয় অবস্থা

মূলোৎপাটন করার কারণে এবং মারাত্নক ও ভয়াবহ কুফরীকে প্রতিহত করার জন্যেঃ

এটা তখন হয়ে থাকে যখন দুইটি কুফরীর মধ্যে যেকোন একটিকে অগ্রাধিকার দেয়া আবশ্যক হয়ে যায়। তখন শারীয়াতের ফয়সালা হচ্ছে অপেক্ষাকৃত কম কুফরী এবং কম ক্ষতিকারক বিষয়কে অগ্রাধিকার দেয়া। যেন কঠিন ও ভয়াবহ কুফরী ও ক্ষতিকারক বিষয়কে প্রতিহত করা যায়।৩

---

৩ কুফরী দুই প্রকার। ছোট ও বড়। ছোট কুফরী মিল্লাত থেকে বের করে দেয় না। আর বড় কুফরী উক্ত ব্যক্তিকে মিল্লাত থেকে বের করে দেয়। বড় কুফরী যা মিল্লাত থেকে বের করে দেয় এটা আবার দুই প্রকার। (১) শুধুমাত্র কুফরী। এটা হচ্ছে সে ব্যক্তি উক্ত কুফরীর দিকে যুদ্ধ, চক্রান্ত, গালি, নিন্দা ইত্যাদি বিষয় সম্পৃক্ত করে না। ফলে তার কুফরী নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। সে তার অনিষ্ট ও অন্যায়কে অন্য ব্যক্তিদের দিকে সম্প্রসারিত করে না । (২) গুরুতর ও মিশ্র কুফ্‌রী, সে তার অনিষ্টকে অন্য ব্যাক্তিদের পর্যন্ত সম্প্রসারিত করে থাকে। এটা হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যার কুফরীর সাথে অন্য কুফরী সংযুক্ত হয়। এর একটি অন্যটি থেকে মারাত্নক। যেমন, আল্লাহ, তদীয় রসূল (সাঃ) ও মুমিনদের সাথে যুদ্ধ করা। এ ছাড়া নিন্দা করা, গালি দেয়া, বিদ্রূপ করা, হত্যা করা, এ ছাড়া বিভিন্ন প্রকার চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র করা যা তার কুফরীকে আরো বাড়িয়ে দেয় এবং তার গুনাহকে অধিক বৃদ্ধি করে। সুতরাং ঈমান যেমন আনুগত্য দ্বারা বৃদ্ধি পায়,তদ্রূপ কুফরীও অবাধ্যতা, যুলুম ও অন্য কুফরী দ্বারা আরো বৃদ্ধি পায়।

তদ্রূপভাবে রিদ্দাহ বা মুর্তাদ হওয়াঃ শুধুমাত্র রিদ্দাহ পাওয়া যেতে পারে এবং পূর্বের আলোচনার ন্যায় মারাত্নক রিদ্দাহ ও পাওয়া যেতে পারে। এর প্রত্যেকটির জন্য বিশেষ বিশেষ আচরণ রয়েছে। যার ফলে ইহকালে ও পরকালে এর বিধান ভিন্ন হয়ে থাকে। যদিও এর প্রত্যেকটি মিল্লাত থেকে বের হয়ে যাওয়া এবং কিয়মতের দিন চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়ার বৈশিষ্ট্য একই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

আর এটাই হচ্ছে সঠিক শ্রেনীবিভাগ। পক্ষান্তরে রিদ্দাহ বা মুর্তাদ হওয়াকে ছোট ও বড় ভাগে বিভক্ত করা কল্পনা প্রসূত বিষয়। যেমন বলা হয় ঃ কুফরীর ন্যায় ছোট রিদ্দাহও উক্ত ব্যক্তিকে মিল্লাত থেকে বের করে দেয় না। এটা হচ্ছে মিথ্যা ও অশুদ্ধ বন্টন। সালাফে সালেহীনের কেউ এমনটি বলেননি। অতএব, এ ব্যাপারে সতর্ক থাকুন।

ইবনে তাইমিয়াহ (রঃ) বলেছেনঃ মুর্তাদ -এর মধ্যে এভাবে পার্থক্য করা হতো যে শুধুমাত্র রিদ্দাহ -এর কারণে তাকে তাওবাহ এর সুযোগ দিয়ে হত্যা করা হতো এবং মারাত্নক রিদ্দাহ-এর কারণে তাওবাহ করার সুযোগ না দিয়েই হত্যা করা হতো। আমরা

উক্ত অবস্থা তখনই সৃষ্টি হয় যখন জাতি এমন ত্বগূত দ্বারা পরীক্ষার সম্মুখীন হয় যার কুফরী গুরুতর; এর একটি অন্যটি থেকে মারাত্মক। দেশ ও বান্দাদের উপরে তার ফিতনা ও বিপদ প্রকট আকার ধারণ করে। তাকে মূলোৎপাটন করা এবং বান্দাদেরকে তার অনিষ্ট থেকে মুক্তি দেয়ার কোন সুযোগ থাকে না। কিন্তু তার সারিতে এবং তার সৈন্যবাহিনীতে প্রবেশ করলে এবং এমন কিছু প্রকাশ করলে যার দ্বারা তার ধারণা হবে যে আপনি তার সেনা ও ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত, তবে তার ঘাড় মটকানো এবং তাকে হত্যা করার সুযোগ ঘটবে।

উক্ত মাসয়ালাহ সম্পর্কে আমাদের ধারণা যে এটা একটি চূড়ান্ত ও স্পষ্ট বিষয়। এটা অধিক স্পষ্ট হওয়ার কারণে এ সম্পর্কে আলোচনা করা, কিংবা বিতর্ক করার প্রয়োজন হয় না। বিশেষকরে জিহাদী দল গুলোর নিকটে; যারা ইসলামী ফিকহের প্রতিটি অংশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। যেন তারা বিশ্বের কুফর ও নাস্তিক ত্বগূতদের বিপরীত বিশাল কর্মে লিপ্ত হওয়ার সময়ে এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে এবং কাজে লাগাতে পারে। যে সকল ত্বগূত ও নাস্তিকগণ স্বীয় মালিকানাধীন সর্বপ্রকার শক্তি ও মাধ্যম দ্বারা সমকালিন জাহেলিয়াতকে লালনপালন করে যাচ্ছে!!

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সুন্নাহ-তে উভয় প্রকারের মধ্যে পার্থক্য দেখতে পাই। একদল মুর্তাদকে তাওবাহ করার পূর্বেই হত্যা করা হয়েছে। তিনি (সাঃ) মক্কা বিজয়ের দিনে মুকীম ইবনে হুবাবাহকে তাওবাহ করার সুযোগ না দিয়েই হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যখন তার রিদ্দাহ বা মুর্তাদ হওয়ার সঙ্গে একজন মুসলিমকে খুন করা, সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া এবং তাকে পাকড়াও করার পূর্বে তাওবাহ না করা একত্রিত হয়েছিল। এবং তিনি (সাঃ) উরাইনাহ গোত্রের লোকদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যখন তারা স্বীয় রিদ্দাহ-এর সাথে পূর্বোল্লিখিত অপরাধ সমূহ-এর ন্যায় অপরাধ সংযুক্ত করেছিল। এমনিভাবে তিনি (সাঃ) ইবনে খাতালকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন–যখন তার রিদ্দাহ-এর সঙ্গে গালি দেয়া ও একজন মুসলিমকে হত্যা করা সংযুক্ত হয়েছিল। এবং তিনি (সাঃ) ইবনে সারাহকে হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। যখন তার রিদ্দাহ-এর সাথে রসূলুল্লাহ (সাঃ) -এর নিন্দা ও মিথ্যা অপবাদ দেয়া যুক্ত হয়েছিল।

কিন্তু আমরা চিন্তা ভাবনা করে ও অনুসন্ধান করে জানতে পেরেছি যে, উক্ত মাসয়ালাটি অনেক ভাইদের নিকট বিতর্কিত ও বিরোধপূর্ণ। তাদের কেউ কেউ এমন দাবী করে মাসয়ালাটি মেনে নিতে অস্বীকার করেন যে, প্রত্যক্ষ ও পরিচিত ইকরাহ বা বাধ্য করণ ব্যতীত কুফরী প্রকাশ করা বৈধ নয়। যার আকৃতি ও প্রকৃতি উক্ত আলোচনার প্রথম অবস্থার মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে!।

উক্ত কারণে আমরা বাধ্য হয়ে বিস্তারিতভাবে ও পরীক্ষা নিরীক্ষা করে উক্ত মাসয়ালা আলোচনা করার মনস্থ করেছি.. আর আল্লাহই হচ্ছেন একমাত্র সাহায্যকারী। আমরা একমাত্র তারই নিকট যথার্থতা ও তাওফীক প্রার্থনা করছি।

আমার বক্তব্য হচ্ছেঃ যদি ত্বগূত ও কুফর ও যুলুম -এর কোন বড় নেতাকে মূলোৎপাটন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তবে মুসলিমদের জন্য তার সেনাবাহিনী ও সৈন্যের সারিতে ঢুকে পড়া এবং সে তাদেরই একজন এমনটি প্রকাশ করাতে কোন দোষ নেই - এই নিয়াতে যে ত্বগূতকে মূলোৎপাটন করা হবে এবং তার অনিষ্ট ও তার ভয়াবহ কুফরী থেকে জাতিকে শান্তি দেয়া যাবে। এটা বিভিন্ন কারণে হয়ে থাকে। নিম্নে -এর প্রমাণ প্রদত্ত হলঃ

প্রথমতঃ শারয়ী নাছ-সমূহ এর বৈধতা প্রমাণ করে। একটি হচ্ছে ইমাম বুখারী (রঃ) স্বীয় সহীহ গ্রন্থে জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

" مَن لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله " فقام محمد ابن مسلمة فقال: يا رسول الله، أتحبُّ أن أقتله؟ قال: " نعم "، قال: فأذنْ لي أن أقول شيئاً، قال: " قلْ "، فأتاه محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقةً، وإنه قد عنَّانا، وإني قد أتيتُك أستسلفُك، قال: وأيضاً والله لتملُّنه ، قال: إنا قد اتبعناه فلا نحبُّ أن ندعَهُ، ننظر إلى أي شيءٍ يصير أمره، وقد أردنا أن تسلفنا وسقاً أو وسقين.. إلى آخر الحديث وفيه: فلما استمكن منه قال: دونَكم، فقتلوه. ثم أتَوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأخبروه.

কা'ব ইবনে আশরাফকে হত্যা করার জন্য কে প্রস্তুত আছ? সে আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সাঃ)-কে অনেক কষ্ট দিয়েছে। মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা উঠে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! (সাঃ) আপনি কি চান যে, আমি গিয়ে তাকে

হত্যা করি। তিনি (সাঃ) বললেনঃ হাঁ, তখন মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা বললেন, তাহলে এব্যাপারে আমি যা ভাল মনে করি আমাকে তা বলার অনুমতি দিন। নবী (সাঃ) বললেনঃ হাঁ, বলো। এরপর মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা কা'ব ইবনে আশরাফের কাছে গিয়ে বললেনঃ এ লোকটি [রসূলুল্লাহ (সাঃ)] আমাদের কাছে শুধু সাদকা চায়। আর সে আমাদেরকে জ্বালাতন ও বিরক্ত করছে। আমি (আজ) তোমার কাছে কিছু ঋণের জন্য এসেছি। কা'ব ইবনে আশরাফ বললো, আরে এখনই জ্বালাতনের কি দেখেছে? আল্লাহর কসম! তোমরাও তাকে অতিষ্ঠ করে তোল। মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা বললেনঃ সে যাই হোক আমরা তো তাকে মেনে নিয়েছি। শেষ পর্যন্ত কি ফল দাঁড়ায় তা না দেখে এখনই তাকে পরিত্যাগ করা ভাল মনে করি না। এখন আমি তোমার কাছে "এক ওয়াসাক বা দু'ওয়াসাক" পরিমান খাদ্য ধার চাই।... (উক্ত হাদীসে আরো বর্ণিত রয়েছে) যখন তিনি সুযোগ পেয়ে গেলেন তখন সঙ্গীদেরকে বললেনঃ এবার নাও। তখন তারা তাকে হত্যা করল এবং নবী (সাঃ)-এর কাছে ফিরে এসে তাঁকে তার হত্যার সুসংবাদ জানাল।

(বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, হা/৩৭৩৫)

ইবনে হাজর (রঃ) আল-ফাতহের ৩/৩৯২ -এর মধ্যে বলেছেনঃ ওয়াক্বিদী -এর বর্ণনায় রয়েছে ঃ সে [রসূলুল্লাহ (সাঃ)] আমাদের নিকট শুধু সাদকা চায়, অথচ আমরা খাইতেই পাচ্ছি না.. কা'ব আবূ নায়েলাকে বললঃ তোমার অন্তরের খবর আমাকে বল। তাঁর [রসূলুল্লাহ (সাঃ)] -এর ব্যাপারে তোমরা কি করতে চাচ্ছ? উত্তরে তিনি বললেনঃ আমরা তাঁকে পরিত্যাগ করতে চাই এবং তাঁর থেকে কেটে পড়তে চাই। এতদশ্রবনে সে বললঃ তুমি আমাকে আনন্দ দিলে।

আমার বক্তব্য হচ্ছেঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) -এর সাহবাগণ ও আল্লাহর দুশমন ইয়াহুদী কা'ব ইবনে আশরাফের মধ্যে উক্ত কথাবার্তার মধ্যে নিঃসন্দেহ স্পষ্ট কুফরী বিদ্যামান। যা স্বাভাবিক অবস্থায় প্রকাশ করা, কিংবা উচ্চারণ করা সম্ভব নয়। তিনি (সাঃ) সাহাবাগণকে যা প্রকাশ করার অনুমতি দিয়েছিলেন, তা হচ্ছে এমন ত্বাগূতকে মূলোৎপাটন করা যার অনিষ্ট আল্লাহ ও তদীয় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ব্যাপারে প্রকট আকার ধারণ করেছিল।

উক্ত হাদীসে কয়েকটিভাবে স্পষ্টকরে কুফরী প্রকাশ করার বিবরণ রয়েছেঃ

একটি হচ্ছেঃ মুহাম্মদ ইবনে মাসলামার মন্তব্যঃ "তিনি [মুহাম্মদ সাঃ] আমাদের নিকট শুধু সাদ্‌কা চায়, অথচ আমরা খাইতেই পাচ্ছি না"। এর তাৎপর্য হচ্ছে, নবী (সাঃ) -এর বিরুদ্ধে যুলুম ও অত্যাচারের অভিযোগ করা। তিনি তো লোকদেরকে সাদকা দিতে বলেন, অথচ তারা খাইতেই পাচ্ছে না...আর এটা নিঃসন্দেহে কুফ্‌র।

আরেকটি হচ্ছেঃ "আর সে আমাদেরকে জ্বালাতন ও বিরক্ত করছে"। অর্থাৎ, আমাদের নিকট সাদকা চেয়ে তিনি আমাদেরকে জ্বালাতন করছেন, অথচ আমরা সাদকা দেওয়ার মত কিছুই পাচ্ছি না। বক্তব্যের দ্বারা এটাই বুঝা যায়। আর এটা নিঃসন্দেহে কুফ্‌র। কেননা এতে নাবীর প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ বিদ্যমান এবং তিনি (সাঃ) স্বীয় রবের নিকট থেকে যে বিধান নিয়ে এসেছেন তার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়েছে।

অন্যটি হচ্ছেঃ তার বক্তব্যঃ "আর সে আমাদেরকে জ্বালাতন ও বিরক্ত করছে" এর দ্বারা যা বুঝা যাচ্ছে, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, এটা কা'বকে এমন মন্তব্য করতে উৎসাহিত করেছেঃ আরে এখনই জ্বালাতনের কি দেখেছে? আল্লাহর কসম! তোমরাও তাকে অতিষ্ঠ করে তুলবে"। অর্থাৎ অচিরেই উক্ত যুলুম ও তোমাদের কাছে তার সাদকা চাওয়া অথচ তোমরা সাদকা করার মত কিছুই পাচ্ছ না, এ সকল কারণে তোমরা নাবীকে ও তার দাওয়াতকে অতিষ্ট করে তুলবে।

আরেকটি হচ্ছেঃ তার মন্তব্যঃ "শেষ পর্যন্ত কি ফল দাঁড়ায় তা না দেখে এখনই তাঁকে পরিত্যাগ করা ভালো মনে করি না"। অর্থাৎ পরিণামের উপর ভিত্তিকরে আমরা তাঁর সাথে অবস্থান করছি। যদি পরিণাম তাঁর পক্ষে যায়, তবে আমরা তাঁর সাথে থাকব এবং উক্ত কারণে আমরা কল্যাণ প্রাপ্ত হব। আর যদি পরিণাম ভিন্ন হয়, তবে আমরা তাকে পরিত্যাগ করব এবং তার থেকে কেটে পড়ব... অতএব, আমরা লক্ষ্য করছি যে তাঁর শেষ ফল কি দাঁড়ায়... আর এটা নিঃসন্দেহে কুফ্‌র।

আরেকটি হচ্ছেঃ আবূ নায়েলার মন্তব্যঃ আর সে মুহাম্মদ ইবনে মাসলামার সাথে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনায় লিপ্ত ছিলঃ "আমরা তাকে পরিত্যাগ করতে চাই এবং তার থেকে কেটে পড়তে চাই"। নিঃসন্দেহে এটা এমন একটি স্পষ্ট শির্‌ক যা ব্যাখ্যা করা এবং অন্য দিকে ফিরানোর কোন সুযোগ নেই... যদি উক্ত কথাকে স্বাভাবিক অবস্থায় বলা হতো, তবে অবশ্যই উক্ত ব্যক্তিকে কাফির হিসাবে আখ্যায়িত করা হতো।

অন্যটি হচ্ছেঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের (সাঃ) -এর দুশমন কা'ব এর মন্তব্যঃ "তোমরাও তাকে অতিষ্ঠ করে তুলবে... এবং তুমি আমাকে আনন্দিত করলে" এটা রসূলুল্লাহ (সাঃ) -এর প্রকাশ্য নিন্দা ও বিদ্রূপ করা... তবুও সাহাবীগণ তার নিকট এর প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেননি এবং তার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধা করার সুযোগ না পাওয়া পর্যন্ত তাঁরা তার বৈঠকেই উপস্থিত ছিলেন। অথচ প্রকৃত কথা হচ্ছেঃ ঘৃণা, বাধ্য করা ও উঠে আসা ব্যতীত কুফ্‌র ও দ্বীন নিয়ে বিদ্রূপ করার মাজলিসে বসা বড় কুফর। তা সত্ত্বেও সাহাবীগণ এমনটি এ জন্যই করেছেন যেন সীমালঙ্ঘনকারী কা'ব ইবনে আশরাফের আকারের সবচেয়ে বড় কুফরীকে মূলোৎপাটন করার সুযোগ পাওয়া যায়। আল্লাহ তার উপর লা'নত করুন।

অন্যটি হচ্ছেঃ নাবী (সাঃ) -এর নিকট সাহাবীগণের (রাঃ) তার সম্পর্কে কিছু কথা বলার অনুমতি চাওয়া। অর্থাৎ এমন কথা বলা, যার দ্বারা নিন্দা ও ঘৃণা প্রকাশ পায়, অথচ স্বাভাবিক অবস্থায় এমন মন্তব্য করা বৈধ নয়। কিন্তু এমন মন্তব্য করা তখনই সম্ভব হতে পারে যখন কোন ব্যক্তি ঈমানের উপর কুফরীকে প্রাধান্য দেয়। নচেৎ বৈধ কথা বলার জন্য অনুমতির প্রয়োজন হয় না!।

উক্ত বিষয়কে ইবনে হাজর (রঃ) আল-ফাত্‌হ এর মধ্যে এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ তিনি বলেনঃ তাঁর মন্তব্যঃ "তাহলে এ ব্যাপারে আমি যা ভাল মনে করি আমাকে তা বলার অনুমতি দিন। নাবী (সাঃ) বললেনঃ হ্যাঁ, বলো...." যেন তিনি তার সাথে কৌশল অবলম্বন করার জন্য, কোন বিষয় রচনা করার উদ্দেশ্যে তাঁর (সাঃ) -কাছে অনুমতি প্রার্থনা করেছেন। এ জন্য গ্রন্থকার এ প্রসঙ্গে অধ্যায় রচনা করেছেনঃ "যুদ্ধে মিথ্যা বলা।" ইবনে সা'দ কর্তৃক উক্ত ঘটনার বিবরণ থেকে প্রকাশ হয় যে, তারা তাঁর (সাঃ) -এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা এবং তাঁর সিদ্ধান্তের ত্রুটি বের করার ব্যাপারে অনুমতি চেয়েছিলেন।

এবং ইকরামা থেকে মুরসাল হিসাবে বর্ণিত আছে যে, আমাদেরকে অনুমতি দিন যে আমরা আপনার ব্যাপারে আঘাত করতে পারি যেন সে আমাদের সম্পর্কে আস্থাশীল হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ "তোমাদের যা ইচ্ছা বলো।"

ইবনে কাছীর (রঃ) আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া এর ৪/৮ -এর মধ্যে মূসা এবং আবূ ইসহাক এর বর্ণনায় ঘটনার পূর্ণ বিবরণ উল্লেখ করেছেন। এতে উল্লেখ রয়েছেঃ তিনি বলেনঃ মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা ফিরে এসে তিন দিন যাবত জীবন বাঁচানোর জন্য যতটুকু প্রয়োজন এতটুকু ব্যতীত খানা - পিনা ছেড়ে দিলেন। উক্ত ঘটনা রসূলুল্লাহ (সাঃ) -এর নিকটে উল্লেখ করা হলে তিনি (সাঃ) তাকে ডেকে বললেনঃ খানা-পিনা ছেড়ে দিয়েছ কেন? উত্তরে তিনি বললেনঃ হে আল্লাহর রসূল! (সাঃ) আপনার সম্পর্কে এমন কিছু মন্তব্য করেছি আমি অবগত নই যে আপনার সম্পর্কে এমনটি মন্তব্য করা ঠিক হয়েছে কিনা! তিনি (সাঃ) বললেনঃ তোমার উপর দায়িত্বই হচ্ছে প্রবল প্রচেষ্টা করা।

তিনি বললেনঃ হে আল্লাহর রসূল! (সাঃ) এমনটি বলা ব্যতীত আমাদের তো অন্য কোন উপায় নেই। তিনি (সাঃ) বললেনঃ তোমাদের যা ভাল মনে হয় বল। তোমরা তো উক্ত কর্ম সমাধানের দায়িত্বে রয়েছ। আশ-শায়বানী আস-সিয়ারের ১/১৮৯-এর মধ্যে বলেছেনঃ আমাদেরকে কিছু বলার অনুমতি দিন। কেননা এমনটি বলা আমাদের প্রয়োজন। অর্থাৎ কিছু কিছু বিষয় প্রয়োগ করে এবং আপনার সম্পর্কে কিছু লাভের বিষয় প্রকাশ করে আমরা তাকে ধোঁকায় ফেলব।

আমার বক্তব্য হচ্ছেঃ উক্ত হাদীসের সকল সনদ একত্রিত করে আলেমগণ যা উপলব্ধি করতে পেরেছেন তা হচ্ছে হাদীসটি উক্ত মাসয়ালার ক্ষেত্রে –একটি শক্তিশালী প্রমাণ। উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত বিষয়সমূহের কোন একটি দিককে খন্ডন করার সম্ভাবনা থাকলেও পূর্বোল্লিখিত প্রমাণিত বিষয়সমূহের সবকিছুকে প্রত্যাখ্যান করা একেবারেই অসম্ভব..... আল্লাহই অধিক অবগত।

অন্য প্রমাণঃ

এটা হচ্ছে সীমালঙ্ঘনকারী খালিদ ইবনে সুফইয়ান ইবনে নাবীহ হাযলী এর নিহত হওয়ার ঘটনা। সে মদীনাতে নাবী (সাঃ) -এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য কিছু লোক সংগ্রহ করেছিল। পূর্ণ হাদীস আহমাদ ও অন্যরা বর্ণনা করেছেন।

আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে ডেকে বললেন ঃ আমার কাছে এ মর্মে সংবাদ পৌঁছেছে যে, খালিদ ইবনে সুফইয়ান হাযলী আমার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য লোকদেরকে একত্রিত করছে। সুতরাং তুমি গিয়ে তাকে হত্যা কর।

অন্য বর্ণনায় রয়েছেঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ সুফইয়ান হাযলীকে হত্যা করতে পারে এমন কে আছ? কেননা সে আমাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করছে, গালি দিচ্ছে এবং আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। বর্ণনাকারী বলেছেনঃ আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে তার কিছু বৈশিষ্ট্য বলে দিন, যেন আমি তাকে চিনতে পারি। তিনি বললেনঃ তুমি তাকে কম্পন অবস্থায় দেখতে পাবে। তিনি বলেনঃ তখন আমি আমার তলোয়ার দ্বারা সজ্জিত হয়ে তাকে আক্রমন করার জন্য বেরিয়ে পড়লাম যখন সে তাদের জন্য প্রাসাদ এর অনুসন্ধানে ব্যস্ত। যখন আছরের সময় হয়ে গেল, তখন আমি তাকে এমন অবস্থায় দেখতে পেলাম যে কম্পনের বিবরণ আমাকে রসূলুল্লাহ (সাঃ) পূর্বেই বর্ণনা করেছিলেন। আমি তার দিকে অগ্রসর হলাম এবং আমার ও তার মধ্যে কোন কিছু ঘটে যাওয়ার আশঙ্কা করলাম। ফলে আমি মাথা দ্বারা ইশারা করে রুকু ও সিজদার মাধ্যমে ছলাত আদায় করে নিলাম। যখন আমি তার কাছে পৌঁছে গেলাম, তখন সে বলল, তুমি কে? উত্তরে আমি বললামঃ আমি আপনার সম্পর্কে এমর্মে সংবাদ পেয়েছি যে, আপনি এই ব্যক্তি নাবী (সাঃ) -এর

জন্য সৈন্য সংগ্রহ করছেন; এ জন্যই আমি আপনার নিকট আগমন করেছি। তখন সে উত্তরে বলল, হ্যাঁ, আমি উক্ত কাজেই লিপ্ত। তিনি বলেন, তার সাথে আমি কিছু পথ চললাম, আর যখন সুযোগ পেয়ে গেলাম, তখন আমি তলোয়ার দ্বারা ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করে ফেললাম। অতঃপর বেরিয়ে পড়লাম এবং শিবিকাগুলি তার উপর উপুড় করে রেখে দিলাম। তারপর যখন আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ) -এর নিকট ফিরে আসলাম, তখন তিনি আমাকে দেখে বললেনঃ সফল হোক। আমি বললামঃ হে আল্লাহর রসূল! (সাঃ) আমি তাকে হত্যা করেছি। তিনি (সাঃ) বললেনঃ তুমি সত্য বলেছ। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে সঙ্গে নিয়ে উঠে পড়লেন। অতঃপর আমাকে তাঁর গৃহে প্রবেশ করালেন এবং আমাকে একটি লাঠি দান করে বললেনঃ হে আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস উক্ত লাঠিটি তোমার কাছে সংরক্ষণ কর... কেননা এটা কিয়ামতের দিন আমার ও তোমার মধ্যে একটি নিদর্শন হয়ে যাবে। নিশ্চয় সেদিন কমসংখ্যক লোকই কোমরে হাত রাখতে পারবে। তিনি বলেনঃ অতঃপর আবদুল্লাহ উক্ত লাঠিকে স্বীয় তলোয়ারের সঙ্গেই রাখতেন। ওটা সর্বদা তাঁর সঙ্গেই থাকত। এমনিভাবে যখন তিনি মৃত্যুবরণ করলেন তখন তিনি লাঠির ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছিলেন। অতঃপর কাফনের মধ্যে ওটাকেও তার সাথে একত্রিত করা হল। অতঃপর আমরা সবকিছুকে দাফন করে দিলাম।৪

সুতরাং আপনি তাঁর উক্ত মন্তব্য নিয়ে চিন্তা করুনঃ "আমি আপনার সম্পর্কে এ মর্মে সংবাদ পেয়েছি যে, আপনি এই ব্যক্তি (নাবী সাঃ) -এর জন্য সৈন্য সংগ্রহ করছেন; এ জন্যেই আমি আপনার নিকট আগমন করেছি" –অর্থাৎ আপনাকে সাহায্য করা এবং নাবী (সাঃ) -এর সাথে যুদ্ধের সময় আপনার দল ভারী করার জন্য আগমন করেছি... এটা নিঃসন্দেহে কুফরী শব্দ। উক্ত ত্বগূতকে মূলোৎপাটন করার প্রয়োজনীয়তা ব্যতীত যদি এটা স্বাভাবিক অবস্থায় বলা হতো, তবে নিশ্চয় এটা বড় কুফ্‌র হয়ে যেত....।

অতঃপর এটা ও চিন্তা করুন যে, যদি উক্ত ত্বগূত ও তার লক্ষ্যকে উপেক্ষা করা হতো তবে ইসলামী দা'ওয়াতের সূচনা ও প্রারম্ভেই কতইনা কষ্টের সম্মুখীন হতো?!

---

৪ আল-হায়শামী মাজমাউয-যাওয়ায়িদ -এর ৬/২০৩ -এর মধ্যে এটা উল্লেখ করেছেন এবং তিনি বলেছেনঃ আহমাদ ও আবূ ইয়ালা অনুরুপ বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন যার নাম উল্লেখ করা হয়নি। তিনি হচ্ছেন ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস। অবশিষ্ট সকল রাবী বিশ্বস্ত। দেখুন-আস সিলসিলাতুছ সহীহাহ্‌, ২৯৮১,

এমনিভাবে আরেকটি দলীল হচ্ছেঃ

নাবী (সাঃ) খন্দক যুদ্ধ চলাকালে মুসলিমদের ব্যাপারে নিরাশ করে দেয়ার জন্য নাঈম ইবনে মাসউদকে নির্দেশ দিয়েছিলেন.....। আবূ সুফিয়ান ইবনে হারব এবং তার কুরাইশী সহযোদ্ধাদেরকে নাঈম ইবনে মাসউদ যা বলেছিলেন তা হচ্ছেঃ তোমরা তো জান যে, তোমাদের সঙ্গে আমার কিরূপ বন্ধুত্ব রয়েছে এবং মুহাম্মদের (সাঃ) সাথে আমার কিরূপ বিভেদ রয়েছে। নিশ্চয় আমার নিকট এমন একটি সংবাদ পৌঁছেছে যে, আমি চিন্তা করে দেখলাম, তোমাদের কল্যাণার্থে এটা তোমাদের কাছে পৌঁছে দেয়া আমার দায়িত্ব; অতএব এটাকে আমার থেকে গোপন রাখ....।

(আল বিদায়া ওয়াল নিহায়া, ৪/১১৩)

যদি প্রশ্ন করা হয়, উক্ত মন্তব্যঃ "তোমরা তো জান যে, তোমাদের সঙ্গে আমার কিরূপ বন্ধুত্ব রয়েছে এবং মুহাম্মদের (সাঃ) সাথে আমার কিরূপ বিভেদ রয়েছে" -এর দ্বারা কুফরী প্রকাশ পায় না?

এর উত্তরে আমি বলবঃ যে মজলিসে কুফরী করা হয়, দ্বীন নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয় এবং আল্লাহ ও তদীয় রসূলের (সাঃ) -এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয় এমন বৈঠকে অস্বীকার এবং উঠে আসা ব্যতীত শুধুমাত্র বসা এবং অবস্থান করাটাই কুফরী। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يُكفر بها ويُستهزأ بها فلا تقعدوا

معهم حتى يخوضوا في حديثٍ غيرِه إنكم إذاً مثلهم

আর কিতাব তথা কুরআনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি এই হুকুম জারি করে দিয়েছেন যে, যখন আল্লাহ তায়ালার আয়াত সমূহের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও বিদ্রূপ হতে শুনবে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা অন্য প্রসঙ্গে চলে যায়। তা না হলে তোমরাও তাদেরই মত হয়ে যাবে।

(সূরা নিসাঃ ১৪০)

অর্থাৎ তোমরা যদি ঘৃণা করা ব্যতীত তাদের সঙ্গে বসার বিষয়টি অস্বীকার কর, তবে তোমরা কুফরীর ক্ষেত্রে তাদের মতই হয়ে যাবে..।

এটা কিরূপে হতে পারে, অথচ উক্ত সাহাবী (রাঃ) কুফর ও আল্লাহ ও তদীয় রসূল (সাঃ) -এর বিরুদ্ধে বৈঠকে বসার সাথে সাথে তাঁর উক্ত মন্তব্য ও সংযুক্ত হয়েছে, যা এইমাত্র উল্লেখ করা হয়েছে.... নিঃসন্দেহ এটা স্পষ্ট কুফরী, যাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু যে জিনিসটি উপরোক্ত সকল বিষয়কে নির্দোষ প্রমাণ করছে তা হল সাহাবী নাঈম ইবনে মাসউদ (রাঃ) -এর নিয়্যাত ছিল মুসলিমদের ব্যাপারে তাদেরকে হতাশ করে দেয়া এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও দা'ওয়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত বিভিন্ন দলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা... আর এটাই অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যার সামনে সেই সাহাবীর (রাঃ) উক্ত মন্তব্যটির গুরুত্ব হালকা হয়ে যায়।

আশ শায়বানী আস সিয়ার এর ১/১৮৫ -এর মধ্যে বলেছেনঃ যখন কোন মুসলিম নিরাপত্তা লাভ ব্যতীত দারুল হারবে প্রবেশ করবে, অতঃপর তাকে মুশরিকগণ আটক করবে, তখন সে তাদেরকে বলবেঃ আমি তোমাদেরই একজন, কিংবা বলবেঃ আমি তোমাদের সঙ্গী হয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এসেছি। তবে তাদের উৎকৃষ্ট ব্যক্তিকে তার হত্যা করা এবং যা ইচ্ছা তাদের সম্পদ গ্রহণ করতে কোন দোষ নেই...। অতঃপর তিনি ত্বগূত খালিদ ইবনে সুফইয়ান হাযলী এবং ত্বগূত কা'ব ইবনে আশরাফের নিহত হওয়ার ঘটনা দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন ...।

আমার বক্তব্য হচ্ছেঃ তাঁর মন্তব্যঃ "আমি তোমাদেরই একজন, কিংবা আমি তোমাদের সঙ্গী হয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এসেছি"... এটা কুফরী। তাদের মধ্যে থেকে উৎকৃষ্ট ব্যক্তিকে তার হত্যা করার জন্য শায়বানীর নিকট এটা একটি অনুমোদন যোগ্য বিষয়। যখন বিষয়টি ঐ রূপ তখন এমন ত্বগূতকে মূলোৎপাটন করার জন্য ওটা অনুমোদনযোগ্য ও বৈধ হওয়ার ব্যাপারে অধিক হকদার, যে ত্বগূত এর কুফরী, সীমালঙ্ঘন ও মুসলিমদের উপর যার অনিষ্ট প্রকট আকার ধারণ করেছে !।

দ্বিতীয়তঃ শারীয়াতের কায়িদায়ে কুল্লিয়াহ (ব্যাপক মূলনীতি) হচ্ছে প্রথম অনিষ্টকে প্রতিহত করা, দু'টি অনিষ্টের অপেক্ষাকৃত হালকাটিতে লিপ্ত হওয়া এবং ঐ দু'টি অনিষ্টের বড়টিকে প্রতিরোধ করা। আর এটাই দ্বীনের মৌলিক মাসয়ালাহ ও শাখাগত মাসয়ালাহর প্রত্যেকটির ক্ষেত্রেই ব্যাপক ভাবে প্রযোজ্য এবং উক্ত মাসয়ালাহসমূহ এর মধ্যে আমাদের উক্ত মাসয়ালাহটি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

এর স্বরূপ হচ্ছে যখন কোন ব্যক্তিকে দু'টি কুফরীর মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণ করার ব্যাপারে স্বাধীনতা দেয়া হবে -এর যে কোন একটি গ্রহণ করা ব্যতীত তার অন্য কোন উপায় থাকে না এবং যে কোন একটি দ্বারা অন্যটিকে প্রতিহত করা ব্যতীত তার জন্য অন্য কোন পথ খোলা থাকে না; এমতাবস্থায় ফিক্‌হ, বিধান ও জ্ঞান এর প্রত্যেকটি আপনাকে বলবে যে, আপনি লক্ষ্য করুন, এতদ্‌উভয়ের মধ্যে কোনটি কুফরীর দিক দিয়ে বেশী এবং ভয়াবহ, সেটাকে প্রতিহত করুন এবং অপেক্ষাকৃত কম কুফরীতে লিপ্ত হয়ে এর মূল কেটে ফেলুন আর এটাই হচ্ছে আমাদের মাসয়ালাহ। অতএব, ত্বগূত, জাতির বক্ষ ও ভাগ্যে সওয়ার হয়ে কুফর,অপরাধ ও হত্যা সহ সকল পদ্ধতির চর্চা করছে....। ফলে উপরোক্ত কারণে নিঃসন্দেহে সে মারাত্মক মিশ্র ও বড় কুফরীর আকার ধারণ করেছে। অতঃপর এটাও স্পষ্ট যে শুধুমাত্র সঙ্কীর্ণাকারে কিছু কুফরীতে লিপ্ত হয়ে গুপ্তহত্যা করা ব্যতীত তাকে মূলোৎপাটন করা সম্ভব নয়। যেমন ওটা ত্বগূত কা'ব ইবনে আশরাফ এবং ত্বগূত সুফইয়ান হাযলীর গুপ্ত হত্যার ঘটনায় উল্লেখিত হয়েছে... সুতরাং ইনশাআল্লাহ আপনি এটা করবেন এতে কোন সমস্যা নেই। উক্ত কর্ম আপনার ব্যাপারে ওয়াজিব পর্যন্ত না গড়ালে এমনটি করা যাবে না।

আপনি যদি ত্বরিৎ গতিশীল কিছু কিছু ব্যক্তিদের গোঁড়ামির কথা নিয়ে চিন্তা করেন এবং তারা বলেছেওঃ এর মাধ্যমে তো কুফরীর কিছু কিছু দিককে বৈধ করা হলঃ

আমি বলবঃ যদি এমনটি না করা হয় তবে আপনার জন্য আবশ্যক হবে এর থেকেও ভয়াবহ কুফরী এবং বান্দাদের ও দেশের উপর মারাত্মক কুফরীর ব্যাপারে চুপ থাকা এবং এ গুলোকে রক্ষা করা ও হিফাযত করা!!

অতএব, আপনি লক্ষ্য করুন,আপনার দ্বীন ও পরকালের জন্য এতদ্‌উভয়ের মধ্যে কোনটি অধিক নিরাপদ ও তুষ্টকারী?!!

আর যদি তারা প্রশ্ন করেন যেমন কারো কারো থেকে এমনটি উল্লেখ করা হয়েছেঃ আবশ্যক বা প্রয়োজন ব্যতীত কুফরীর বৈধতা দেয়া হয় না। কেননা আবশ্যক বা প্রয়োজন ব্যতীত নিষিদ্ধ কর্ম বৈধ হয় না। আর ত্বগূতকে অপসারণ করা হচ্ছে 'প্রয়োজন' আবশ্যক নয়!!

আমি বলবঃ যে ত্বগূত আল্লাহ আয্‌যা ওয়া জাল্লা এর শারীয়াত অনুযায়ী আমল করা বন্ধ করে দিয়েছে, তাওহীদ ও একত্ববাদীদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে, সকল প্রকার কুফরী, পাপাচার এবং দ্বীন নিয়ে ব্যঙ্গ করার কর্মে পূর্ণমাত্রায় লিপ্ত ;যার মাধ্যমে সে বান্দাদের ও দেশ সমূহকে ধবংস করে দিচ্ছে এবং তাদের উপর নিকৃষ্ট আযাব, লাঞ্ছনা ও দরিদ্রতা চাপিয়ে দিয়েছে.... আমার বক্তব্য হচ্ছেঃ যে ত্বগূতের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য এরূপ তাকে অপসারণ করা এবং তার কুফরী ও অনিষ্ট থেকে জাতিকে মুক্তি দেয়া প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, যেমন ধোয়ার যন্ত্র ও আইসবক্স অর্জন করা হয়?!

যখন উক্ত ত্বগূত ও এর অনুরূপ জিনিসকে উৎখাত করা প্রয়োজনীয় বিষয় -এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে এবং আবশ্যকীয় বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়, তবে হে ফক্বীহগণ আপনাদের নিকট আবশ্যকীয় বিষয় কি কি?!!

এমন ত্বগূত যারা ইলাহের বৈশিষ্ট্যসমূহের উপরে উঠে গিয়েছে এবং যাদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে পূজা করা হচ্ছে আপনাদের নিকট যখন এদেরকে অপসারণ করার বিষয়টি আবশ্যকীয় বিষয়সমূহের পর্যায়ে পৌঁছায় না, তবে আপনাদের নিকট আবশ্যকীয় বিষয় বলতে কিছুই পাওয়া যাবে না!!

এটা জানা কথা যে,নিশ্চয় দ্বীন নূহ (আঃ) থেকে নিয়ে আমাদের নবী মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত -দু'টি মহান স্তম্ভের উপর দন্ডায়মান রয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে ত্বগূতকে অস্বীকার করা, এটাকে অপসারণ করা, মূলোৎপাটন করা এবং ঘৃণা করা। দ্বিতীয় স্তম্ভ হচ্ছে আল্লাহ আয্‌যা ওয়া জাল্লা এর জন্যই সকল দাসত্বকে প্রকৃত রূপ দেয়া। আর এটাই হচ্ছে লা -ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অর্থ। যে জন্য আল্লাহ তায়ালা সকল মাখলূককে সৃষ্টি করেছেন... আর এটাই সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য; এর থেকে বড় কোন

উদ্দেশ্য নেই। এ পথেই সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মূল্যহীন হয়ে যায় মাধ্যম ও অন্যান্য পথ তো দূরের কথা।

হে ফক্বীহগণ! আপনাদের কাছে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের মধ্য থেকে দ্বীন ও তাওহীদের উত্তেজনাকর এমন রুক্‌ন ও রয়েছে কি যা আবশ্যকীয় বিষয়সমূহের স্তরে পৌঁছতে পারে না?!!

তৃতীয়তঃ যখন বিষয়টি ঐরূপ যেমন সাহাবী ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ কোন ব্যক্তির জন্য এমন কথা বলা বৈধ যার দ্বারা সে নিজের থেকে একটি বেত্রাঘাত, কিংবা দুইটি বেত্রাঘাত প্রতিহত করতে পারে... অতএব, তার জন্য এমন কথা বলা কিরূপে বৈধ হবে না যার মাধ্যমে সে ব্যক্তি নিজের থেকে এবং স্বীয় জাতির থেকে খুন, হত্যা, লাঞ্ছনা, দমন-পীড়ন এবং সর্বপ্রকার গুরুতর কুফরীকে প্রতিহত করতে পারবে?!!

আর যখন একটি বেত্রাঘাত, কিংবা দুইটি বেত্রাঘাতকে প্রতিহত করা এমন আবশ্যকীয় বিষয় হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে যা নিষিদ্ধ কাজের অনুমোদন দিয়ে দেয়; তবে মুসলিম ও তাদের শিশু ও নারীদের অধিকারের ক্ষেত্রে হত্যা ও সামগ্রিক কসাইখানাকে প্রতিহত করা যা ভূগৃত প্রতিনিয়ত করে যাচ্ছে এমন আবশ্যকীয় বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত কি ভাবে হবে না যা নিষিদ্ধ কর্ম সমূহকে অনুমোদন দিয়ে দেয় ?!!

চতুর্থতঃ উক্ত পথে এই উম্মাহর মুজাহিদগণের মধ্য থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ চলেছেন। সাহাবীগণের মধ্য হতে মুহাম্মদ ইবনে মাসলামাহ, নাঈম ইবনে মাসউদ, আবূ নায়িলাহ ও আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস সর্বপ্রথম উক্ত পথে গমন করেছেন.... উক্ত পথ ধরে সাহসিকতার সাথে অগ্রসর হয়েছিলেন ছালাহুদ্দীন আইয়ূবী (রঃ)। যিনি কাফির ফাতিমী আবীদি রাজ্যের একজন মন্ত্রী ছিলেন। অবশেষে তিনি আবীদগণের আকৃতিতে কুফরীর মূলোৎপাটন করতে সক্ষম হন এবং প্রত্যেক রাষ্ট্রকে জিহাদকারী সুন্নী ইসলামী রাষ্ট্রে পরিবর্তন করতে সমর্থ হন। অবশেষে সাহসিকতার সাথে উক্ত পথে চলেন খালিদ ইস্তাম্বূলী এবং এমন সঙ্গীগণ যারা প্রভাববিস্তারকারী জাতির বিশ্বাসঘাতকের হাত থেকে উক্ত উম্মাতকে শান্তি দিয়েছিলেন!।

আর আমাদের পূর্বের আলোচনার বিপরীত মন্তব্য করার দ্বারা আবশ্যক হচ্ছে ঐ সকল বীর ও অন্যান্যদের প্রতি কুফরীর অভিযোগ করা; আমরা এমন কর্ম হতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাই।

উক্ত অবস্থায় কিছু সতর্ক বার্তা ও কিছু নীতিমালাঃ

পূর্বের আলোচনা হতে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বের করে আনতে পারিঃ

১. বড় কুফ্‌র এবং মারাত্মক কুফর এবং যারা সীমালঙ্ঘনকারী অপরাধী ও তাদের কুফরের আকৃতিতে হয়ে থাকে এর মূলোৎপাটনের আবশ্যকীয়তা ব্যতীত কুফরী প্রকাশ করা বৈধ নয়....। আর আমরা এটা ও মনে করিনা যে, অনুরূপ কুফরী, কিংবা এর থেকে ছোট কুফরীকে প্রতিহত করার জন্য কোন কথা বা কর্মের মাধ্যমে কুফরী প্রকাশ করা যাবে।

২. যখন মিশ্র ও ভয়াবহ কুফরীতে লিপ্ত তৃগূতকে মূলোৎপাটন করার সম্ভাব্য সকল মাধ্যম নিঃশেষ হয়ে যাবে তবেই শুধু উক্ত পদ্ধতির আশ্রয় নেয়া যাবে...। কিন্তু যখন অন্যান্য মাধ্যম ও পথ পুরোপুরি বিদ্যমান থাকবে, তখন উক্ত পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করা বৈধ নয়।

৩. উক্ত অনুমোদন কার্যকর করার সময় ওয়াজিব হচ্ছে কুফরী বাক্য উচ্চারণ না করা, কিংবা কুফরীতে লিপ্ত না হওয়ার সম্ভাব্য পথ তালাশ করা... কিন্তু যদি প্রয়োজন দেখা দেয় তবে বাড়াবাড়ি, কিংবা ব্যাপকতা ব্যতীত কুফরী প্রকাশ করা...।

৪. স্বাভাবিকভাবে ঘটনাটি কার্যকর করার ক্ষমতা থাকলে এবং এটাই যদি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধা করার জন্য যথেষ্ট হয়... তবে কুফরী প্রকাশ করা, কিংবা কুফরী বাক্য উচ্চারণ করার অনুমোদনের দিকে আশ্রয় নেয়া বৈধ নয়। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

"তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর"। (সূরা তাগাবূনঃ ১৬)

৫. জিহাদের ক্ষেত্রে এমন কিছু কাজ বৈধ যা অন্যান্য ক্ষেত্রে বৈধ নয়। যুদ্ধরত মুজাহিদের জন্য যা কিছু বৈধ, অন্যান্য উপবিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য তা বৈধ নয়...। এটা এমন একটি স্পষ্ট মাসয়ালাহ্‌ যার পক্ষে কিতাব ও সুন্নাহর অনেক দলীল বিদ্যমান রয়েছে। পৃথকভাবে এর আলোচনা করার প্রয়োজন হবে। অনেক সময় নতুন গ্রন্থের প্রয়োজন দেখা দিবে।

অতঃপর....

এখানেই আল্লাহ তায়ালার দয়া, অনুগ্রহ ও সাহায্যে উক্ত সংক্ষিপ্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার সমাপ্তি ঘটছে। আশা করি আল্লাহ তায়ালা এটা গ্রহণ করে নিবেন এবং এর মাধ্যমে বান্দাদেরকে উপকৃত করবেন। বিশেষকরে তাদের মধ্য থেকে উম্মাতের কার্যরত মুজাহিদীনদের মধ্য থেকে সম্মুখভাগে অবস্থানরত ব্যক্তিদেরকে উপকৃত করবেন, যারা ইসলামী ফিকহের প্রতিটি অংশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। যেন তারা এর থেকে উপকৃত হন। যেহেতু তাঁরা সঠিক ইসলামী জীবন সূচনা করার জন্য জিহাদ ও প্রচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছেন...। নিশ্চয় তিনি মহান, সর্বশ্রোতা, সদা নিকটবর্তী ও দোয়া কবুলকারী।

وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين